সমর সেন প্রসঙ্গে

অশোক মিত্র

(একটি কথোপকথন)

প্রশ্ন : সমর সেনের কবিতার কোন্ বৈশিষ্ট্য আপনাকে, আপনার প্রথম যৌবনে, আকৃষ্ট করেছিল সবচাইতে বেশি? কোন্ কোন্ কারণে তাঁকে স্বতন্ত্র মনে হয়েছিল? সমর সেনের কবিতায় গদ্যছন্দের অভিনবত্ব ও নিস্পৃহ বাচনভঙ্গির আপাত-চমকটুকু বাদ দিলে, বক্তব্যের বা কাব্যবস্তুর কোন্ অভিঘাত আপনাকে তখন বেশি অভিভূত করেছিল? আর আজকের এই পরিণত বয়সে ও মানসে সমর সেনের কবিতাকে আপনি কীভবে গ্রহণ করে থাকেন?

উত্তর : তিনটি আলাদা বিষয়ের উল্লেখ করতে হয়। ষোলো সতেরো বছর বয়সে যে-কোনো বাঙালি তরুণের মন খানিকটা আবেগ ঘন থাকে। সুতরাং এমনকি যাঁরা স্বদেশ ও সমাজের চিন্তাতেও ভীষণ মগ্ন, তাঁরাও প্রেমের কবিতার প্রতি তাই ঐ বয়সে কিছু আগ্রহশীল হতে বাধ্য। কিন্তু সমর সেনের প্রেমের কবিতায়, আমার মতো সেই চল্লিশ দশকের তরুণের কাছে যা একেবারে নতুন স্বাদের মনে হয়েছিল, তা প্রেমের কবিতা, অথচ তার মধ্যেও অন্ধকার, কশাঘাত, বিদ্রূপ। অনুরাগের কথা বলা হচ্ছে কিন্তু সেই সঙ্গে মৃত্যুর কথাও। নিখাদ প্রেম, তাতে কোনো কপটতা নেই, অথচ, তাহলেও, এই প্রেম যেন একটি পোশাকি, সংস্কারগত ব্যাপার মাত্র। নির্দয়তা কতটা প্রবল হতে পারে তা সমর সেনের কবিতা থেকে সেই সময়ে আমাদের কাছে অন্তত ভীষণ রকম প্রকট হয়েছিল। ইংরেজি পাঠ্যক্রমে একটি-দু'টি টিউডর কবির রচনায় এ ধরনের সংশ্লেষণ আমাদের চোখে পড়েছিল, কিন্তু সমর সেন পুরো জিনিশটা, তাঁর ভাষার সহজ সম্মোহনে, সরাসরি আমাদের সমসাময়িকতায় স্থাপন করলেন। সেই সঙ্গে আর যে দুটো কথা বলতে চাই, একটির উল্লেখ অবশ্য আপনি নিজেই করেছেন—গদ্য বাঁধুনী, গদ্যছন্দ, অথচ তাতে রবীন্দ্রনাথের ন্যূনতম প্রভাব নেই। আমরা তার আগে 'লিপিকা'র অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে গেছি, 'শেষ সপ্তক' পড়েছি। কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ আলাদা পরিমণ্ডল, আমাদের নিজেদের ঘরোয়া পৃথিবী, যে-ছন্দে কবিতা লেখা হচ্ছে সেই ছন্দে আমরা কথা বলছি, যে-ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে তা আমাদের প্রাত্যহিকতার ভাষা, আমাদের খিস্তি-খেউড় পর্যন্ত ঢুকে গেছে—অথচ কবিতা, অথচ লিরিক কবিতা। দ্বিতীয় যে-কথাটি এখন উচ্চারণ করতে পারি, সমর-বাবুর জীবদ্দশায় হয়ত করতে পারতাম না : বাঙালি মধ্যবিত্ত কাপুরুষতা, অসাধুতা, লোক-ছাপানো লোক-দেখানো ব্যাপারাদি এ-সমস্ত কিছুর যে অনায়াস বেপরোয়া বিরুদ্ধাচরণ করা চলে এবং কবিতার মধ্যবর্তিতায়, তা তিনি দৃষ্টান্তিত করেছিলেন।

এটা হয়ত এখন লোকলজ্জার ব্যাপার হতে পারে, এই ঘোষণা বা স্বীকারোক্তি, কিন্তু পঁয়তাল্লিশ বছর বাদেও সমর সেনের কবিতা সম্বন্ধে আমার যে প্রাথমিক অনুরাগ, তা এখনো অব্যাহত। আমি এখনও সেই কবিতার অবয়বে অসম্ভব শক্তি খুঁজে পাই, সেই সঙ্গে অসম্ভব মমতাও খুঁজে পাই।

প্রশ্ন : সমর সেনের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিভিন্ন পঙ্‌ক্তির যে-ব্যবহার, সেটাকে কি কোনো প্রভাব বলা যাবে?

উত্তর : সেটা তো একেবারে উল্টো-বুঝলি রাম হবে, এই ব্যবহার প্রভাব নয়, অতি স্পষ্টত প্রভাব-বিরোধিতা। সমরবাবু যে-প্রকরণ শুরু করেছিলেন তা এক অর্থে মৌলিক নয়, কারণ এলিয়টের কবিতাতেও ঠিক এই ধরনের ধ্রুপদী বাক্য বা পঙ্‌ক্তির ব্যঙ্গোচ্চারণ ছিল, তারই প্রতিধ্বনি আমরা সমর-বাবুর কবিতায় পাই। যেহেতু আমাদের বাঙালি জীবন আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে তখন রবীন্দ্রনাথ, তাই ঐ জীবন ধারণকে ব্যঙ্গ করতে হলে রবীন্দ্রনাথের পঙ্‌ক্তি ধরেই ব্যঙ্গ করার সামাজিক প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছিলেন। সুতরাং রবীন্দ্রপ্রেম নয়, আমি বলব সেই সময়ে রবীন্দ্র-অপ্রেমের পরিচয় বহন করছিল উক্ত উদ্ধৃতিগুলি।

প্রশ্ন : 'নাগরিক কবি'—এই সুপরিচিত অভিধা সম্পর্কে আপনার মত কী?

উত্তর : নাগরিকতা সাদামাটা ব্যাখ্যায় শহুরেপনা, কিন্তু নাগরিকতা আবার সংস্কৃত, পরিশীলিত হওয়ার ব্যাপারও বোঝায়। সমরবাবুর কবিতায় আমি বলব, পরিশীলিত পরিবেশই অনেক বেশি ফুটে উঠেছে। তিনি 'বাংলার বধূ বুকভরা মধু' গোছের উচ্ছ্বাস রচনা করেননি, বরং বিদ্রূপে জর্জরিত করেছেন। কিন্তু সমাজ তো শহরের বাইরে যে-পরিবেশ তা বাদ দিয়ে নয় বিশেষ করে ভারতবর্ষের মতো দেশের পক্ষে। যখন তিনি ক্ষেত খামারের কথা লেখেন, মাঝি মেঝেনদের কথা, কলকারখানার শ্রমিকদের কথা, লেখেন গলিত অন্ধকারে মরা মাঠ ধূ ধূ করে, সবকিছু জড়িয়েই লেখেন। তিনি উন্নাসিক শহুরে কবি ছিলেন এই অপবাদ মানতে আমি রাজি নই।

প্রশ্ন : এক সময় বামপন্থী মহলে, বিশেষত বিনয় ঘোষ, সরোজ দত্তর লেখায়, কঠোরভাবে সমালোচিত হয়েছিলেন কবি সমর সেন; ধূর্জটিপ্রসাদও মার্কসবাদী কবির গুণাবলীর অভাব লক্ষ করেছিলেন তাঁর কবিতায়। এ-বিষয়ে আপনার ধারণা কী ছিল? আজ কী মনে হয়?

উত্তর : প্রথাগত মার্কসবাদের ব্যাপারটি খুব গোলমেলে, কারণ কেউ একটা দাবি করে বসলেন যে তাঁরাই মার্কসের সারাৎসার বুঝতে পেরেছেন, অন্যরা পারেননি—সেক্ষেত্রে কিছু বলার থাকে না, দাবিটি তো ধর্মবিশ্বাসের পর্যায়ে চলে যায়। তবে

মার্কসপন্থী মহলে সমরবাবুর কবিতা সম্বন্ধে বরাবরই খানিকটা প্রশ্ন থেকে গেছে অনেকের মনে। কারণ, এটা অবশ্য মেনে নিতে হয় যিনি মার্কসবাদী তাঁকে প্রত্যয়বাদী হতে হবে, হতাশায় ঢ'লে পড়লে চলবে না, সুড়ঙ্গের শেষে তাঁকে আলো দেখতেই হবে। অথচ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন কয়েকটি বছর বাদ দিলে, সমরবাবুর সমগ্রকাব্য প্রবাহেই হতাশা সমাচ্ছন্ন, প্রেমের কবিতাতে হতাশা, স্বদেশের কবিতাতে হতাশা, জনগণকে ভাল লাগার, ভালবাসার, জনগণকে অভিবাদন জানাবার কবিতাতেও শেষ পর্যন্ত এক ধরনের সব লেপে দেওয়া অন্ধকার। একদিন আলোর আকাশ-গঙ্গা পৃথিবীকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, এই প্রত্যয়ের পাশাপাশি নিজের অসহায় একাকিত্ব সম্পর্কে নিটোল স্বীকারোক্তি। কিন্তু হতাশাই যদি যথার্থ প্রতীতি হয় সেই হতাশার প্রকাশ কেন তাহলে সামাজিক সত্য বলে বিবেচিত হবে না, সেই সমস্যা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। এবং যেখানে কবি নিজে বলছেন যে তিনি এই ঘুণধরা সমাজের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন, তাকে দিয়ে কিছু হবার নয়; কাদের দিয়ে হবে, ছুতোরকে দিয়ে হবে, দুধ দেয় যে গয়লা, যে-মেথর সরায় ময়লা তাদের দিয়ে হবে যে-স্থপতি তৈরি করে তাকে দিয়ে হবে—তিনি তাদের অভিনন্দন-অভিবাদন জানিয়ে যাবেন, তাঁর নিজের আকাশ অন্ধকারে বিলীন থাকবে কিন্তু তিনি এটা মেনে নিচ্ছেন যে তাঁর আলাদা আকাশ পৃথিবীর অখণ্ড আকাশ নয়, খেটে-খাওয়া সৃষ্টিশীল মানুষের পরিমণ্ডল নয়, তাদের জন্য একদিন অবশ্যই আকাশগঙ্গা পৃথিবীতে নামবে, কারণ তারা নিজেরাই, নিজেদের সৃষ্টি দিয়ে সেটা সম্ভব করে। নিজেকে তিনি সমাজ থেকে ঈষৎ বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে অবশ্যই দেখতেন, কিন্তু সামাজিক অনুভাবনা তাঁকে স্পর্শ করেনি এরকম উক্তি পুরোপুরি বাস্তবতাহীন। তিনি এক হিসেবে হতাশার কবি, কিন্তু সেই হতাশার সঙ্গে প্রায় গায়ে গায়ে লেপ্টে মেশানো তাঁর প্রত্যয়, যে এই পৃথিবীতে নতুন সমাজব্যবস্থা রচিত হবেই। সমরবাবু লিখেছিলেন, 'বিধ্বস্ত মাটিতে আনে ট্রাক্টরের দিন। জোসেফ স্টালিন'। পঙ্‌ক্তিটি আমার বিশেষ করে মনে আসার কারণ ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় বাংলা প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখতে কোথাও ব্যবহার করেছিলাম বলে পরীক্ষক, জনশ্রুতি শুনেছিলাম, কুড়ি নম্বর কেটে দিয়েছিলেন। —এই কথাগুলি তো প্রত্যয়েরই কথা, যে প্রত্যয় ছড়িয়ে আছে তাঁর কবিতায় যত্রতত্র একদিকে নিজের সম্বন্ধে কুঁকড়ে আসা, নিজেকেই আঘাত হানা, কিন্তু পাশাপাশি যেখানে নতুন সমাজ বপনের স্বপ্নের ইঙ্গিত, সেই স্বপ্নের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়া। আমার পূর্বসুরীদের সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা অটুট, কিন্তু যে-কোনো গণতান্ত্রিক পরিবেশে মতান্তরের অবকাশ আছে, থাকবে।

প্রশ্ন : অনুকারদের ভয়ে সমর সেন কবিতা লেখা ছেড়েছেন, এই রকম একটি অনুমানের কথা আপনি বলেছেন এক লেখায়। অন্য কোনো কারণ কি এখন আপনার মনে

হয়? অরুণকুমার সরকার লিখেছেন, কবিতাকে সমর সেন খুব একটা সিরিয়াসলি নেননি কোনো দিন, রুদ্ধরতি ও রাজনীতির কিছু ফরমাস খাটিয়ে তাকে নাকি তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। আপনি কী মনে করেন?

উত্তর : অরুণকুমার সরকার আমার অন্যতম, অন্তরঙ্গতম বন্ধু ছিলেন, তা সত্ত্বেও সমর সেনের কাব্য বিশ্লেষণের ব্যাপারে তাঁর মতের সঙ্গে আমার মতের বিস্তর তফাত। সমরবাবু কেন কবিতা লেখা থেকে নিজেকে সংবৃত করলেন সে-সম্পর্কে এখন আমার মনে হয় দুটো আলাদা ব্যাখ্যা সম্ভব। একটির উল্লেখ আমি বছর পঁচিশ আগে একবার করেছিলাম। এন্তার বাজে কবিতা লেখা হয়েছিল সমরবাবুকে অনুসরণ, অনুকরণ করে—আধা-সাম্যবাদী কবিতা, আধা-খিস্তির কবিতাও—এবং কাঁচা খিস্তিরই—যাতে কোনো রকম কাব্যরস আদৌ ছিল না। আমি এর বেশি বলতে চাই না, যদিও মনে পড়ছে একটা-দুটো লাইন—এর-ওর-তার কবিতা থেকে। এই ব্যাপারটি কবিতার প্রতি সমরবাবুর বীতরাগের নিশ্চয়ই একটা বড় কারণ ছিল। তিনি তিতিবিরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন—কী দরকার আর লিখে হয়েতা তাঁর মনে হয়েছিল, অনুকারদের যদি অনুকরণ করতে হয়।

দ্বিতীয় যে মস্ত কারণ, সমরবাবুর বরাবরই অসম্ভব পরিমিতি বোধ ছিল, পুনরুক্তি ওঁর ঘোর অপছন্দ। এটাও আমি দেখেছি, যে-কথাটি আমি গোটা কুড়ি বাক্য ব্যবহার করে বলতে চাইছি, সমরবাবু হয়ত তা দুটি বাক্যের পরিসরে বলে বেরিয়ে যেতে পারতেন। এখানেও হয়ত তিনি ভেবেছিলেন যে, যা বলবার তা তো বলেই দিয়েছেন, সব কবিতাই তো শেষ পর্যন্ত পুনর্লিখন, সুতরাং কী হবে নিজেকে বারবার একই কথা বলতে প্রবৃত্ত করে? আরো একটি মন্তব্য সংযোজন করতে আমার খুব সংকোচ হচ্ছে, কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমার কতগুলি ধারণা আছে, বিষ্ণুবাবু সম্পর্কেও। শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কিছুটা পরিমিতি এসেছিল, এবং সেই পরিমিতি থেকে তাঁর কবিতা অনেক গভীরতায় পৌঁছেছিল বলেই আমার বিশ্বাস। এবং এটা রবীন্দ্রনাথ স্বভাব-বিরোধী ব্যাপার করেছিলেন, কারণ উনি একটু অতিকথন-অতিলিখন বরাবরই ভালবাসতেন। কিন্তু শেষের দিকের, তিন-চার বছর, হয়ত শারীরিক অক্ষমতার জন্যই তাঁকে বাধ্য হয়ে কম করে কথা বলতে হয়েছিল। তাতে কাব্যের উৎকর্ষ বহুগুণ বৃদ্ধিই পেয়েছিল। অন্য দিকে আমার কাছে খুব মন-খারাপ-করা ও শোকান্তিক ব্যাপার বলে মনে হয় যে তাঁর জীবনের শেষ কয়েক বছর বিষ্ণুবাবু এমন অনেক কবিতা লিখেছেন যেগুলি হয়ত না লিখলেও চলত। আমরা নতুন কিছু সে-সব কবিতা থেকে আর পাচ্ছি না, খুব বেদনাহত হতাম যে কেন ওঁকে দিয়ে প্রায় জোর করে যেন এই ধরনের কবিতাগুলো লেখানো হচ্ছে।

সেদিক থেকে বিচার করলে মনে হয় কবিতা লেখা বন্ধ করে দিয়ে সমরবাবু অত্যন্ত বিচক্ষণতারই পরিচয় দিয়েছিলেন। আক্ষেপ হয়, অমন ক্ষমতাবান প্রতিভাবান কবি যদি আরো কিছু লিখতেন, বাংলা কাব্যের অনন্ত উপকার হত। কিন্তু তাঁর দিক থেকে, মনে হয়, ঠিক সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছিলেন।

প্রশ্ন : 'বাবু বৃত্তান্ত' সম্পর্কে আপনার মত কী? সমর সেনের গদ্যের কোন্ বৈশিষ্ট্য আপনকে আকৃষ্ট করে?

উত্তর : 'বাবু বৃত্তান্ত', এটা সবাই মানবেন স্বয়ংসম্পূর্ণ আত্মজীবনী নয়। কতগুলি প্রসঙ্গ বা ঘটনার কথা তাঁর থেকে থেকে মনে পড়েছে, শারীরিক অসুস্থ ছিলেন, বাড়িতে বন্দী, কখনও-কখনও লিখে ফেলতেন, তারপর সেই টুকরো টুকরো লেখাগুলি জড়ো করেছেন। সুতরাং একটু অবিন্যস্ত ব্যাপার। কিন্তু তাহলেও মানুষটির চরিত্র-প্রকৃতি তো আমরা ফুটে বেরোতে দেখি, একটি ইতিহাসক্রমও খুঁজে পাই। যে-ধরনের সামাজিক বিন্যাসের ভিতর দিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং কবিত্ব বিকশিত হয়েছিল, তার বিবরণের দলিল হিসেবে বেঁচে থাকবে 'বাবু বৃত্তান্ত'।

সমরবাবুর গদ্য সম্পর্কে প্রথম কথা, উনি পোস্টকার্ড যে ভাষায় লিখতেন সেই ভাষায়ই গদ্য লিখতেন—কোনো রকম পোশাকি সাজা বা আড়ষ্টতা নেই। সোজা লিখে যাচ্ছেন—যেমন ভাবে কথা বলছেন তেমন ভাবেই লিখছেন, একটু ঠাট্টা, একটু বিদ্রূপ, কিন্তু সব কিছুই খুব কম কথায়। আমার বারবার প্রমথ চৌধুরী মশাই-এর একটি লাইন মনে পড়ে—'ঘোষালের ত্রিকথা' থেকে—'ঘোষাল তুমি কম কথা বলার আর্ট শেখো'। আমি সমরবাবুর গদ্যে সেই কম কথা বলার আর্টটা দেখতে পাই।

প্রশ্ন : কবি সমর সেন ও সাংবাদিক সমর সেনের ভিতর সত্যি কি কোনো বিরোধ আছে বলে আপনি মনে করেন? সাংবাদিক সমর সেনের বিকাশের জন্য কবি সমর সেনের মৃত্যু কি একান্তই অনিবার্য ছিল? কবি হিসাবে সমর সেন যেখানে থেমেছিলেন, সমাজ-সচেতন, প্রতিবাদী সাংবাদিক হিসেবে তিনি কি শুরু করেছেন সেখান থেকেই? অর্থাৎ, কবিতায় যা করবার কথা ভেবেছিলেন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কি তাই সম্পাদন করতে চেয়েছেন তিনি?

উত্তর : একটা মস্ত বড় জাতির কথা আমরা ভুলে যাচ্ছি। সমরবাবু কবিতা লেখা প্রকৃতপক্ষে বন্ধ করে দিয়েছিলেন ১৯৪৭-৪৮ সালে, তারপর ঈশ্বর গুপ্তের পয়ারের ঢঙে একটি-দুটি কবিতা, হয়ত তার পরেও লিখে থাকবেন। 'নাউ' প্রকাশিত হতে শুরু হল ১৯৬৪ সালে অর্থাৎ মাঝখানে পনেরো-ষোলো বছরের দীর্ঘ ব্যবধান। সুতরাং একটি সত্তার মৃত্যু না ঘটলে আর একটি আরম্ভ হতে পারত না, এই ব্যাখ্যার এমন কি আক্ষরিক কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণও নেই। উনি যে, প্রতিবাদধর্মী সাংবাদিকতা

শুরু করলেন তা অনেকটা আকস্মিকতার ব্যাপার। প্রথাগত সাংবাদিক ছিলেন বহু বছর ধরে এবং বাজারি কাগজে কাজ করছিলেন। হয়ত সহ্য-শক্তি আরো যদি একটু বেশি হত তাহলে আরো কয়েক বছর ও ধরনের কাজ করে যেতে পারতেন, কিন্তু হিন্দু মুসলমান দাঙ্গায় যেখানে কাজ করছিলেন সেই পত্রিকাগোষ্ঠীর ন্যক্কারজনক ভূমিকা, বিবমিষা, বিবেকের দায়—১৯৬৪ সালে কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। তারপর ঈষৎ ঘটনা-পরম্পরায় 'নাউ' সম্পাদনায় চলে এলেন। এবং এখানেও, ব্যক্তিগত ইতিহাস খানিকটা ভালভাবে জানি বলে বলতে পারছি। প্রথমি দিকে 'নাউ' কিন্তু আদৌ রাজনীতি-সচেতন পত্রিকা ছিল না। সমরবাবু ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবরা লিখতেন, সম্পাদকীয় বা অন্যান্য রচনা, তাঁদের মধ্যে প্রায় অনেকেরই রাজনীতি সম্পর্কে তেমন প্রত্যক্ষ আগ্রহ ছিল না। এবং আমাকে বাদ দিলে আর যাঁরা সম্পাদকীয় লিখতেন তাঁদের মনে প্রধানত আমারই তাগিদে সমরবাবু যে নাউ-কে রাজনীতি-মুখর করে তুললেন, তা নিয়ে প্রচুর সংশয় ছিল। আমি নাম করতে চাই না এই অতি প্রিয় বন্ধুবান্ধবদের, কেউ কেউ এখনও বেঁচে আছেন, কেউ কেউ প্রয়াত হয়েছেন। কিন্তু তখন খুব একটা নিজেদের ভিতর বলাবলি হত সমরবাবু এটা কী করলেন! দিব্যি তো এক ধরনের শৌখিন কাগজ বার হচ্ছিল, অনেকটা স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় সোমবারের ক্যালকাটা নোটবুকের মতন, খুব সপ্রতিভ কথাবার্তা, চতুর শব্দ ও বাক্যের সমাবেশ, একটি-দুটি-শিথিল মন্তব্য, কলকাতায় সামাজিক পরিবেশে কী ঘটছে না ঘটছে তা নিয়ে; হঠাৎ ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাস থেকে চরিত্র ব্যত্যয় ঘটল। অন্তরঙ্গদের অনেকেরই মন খারাপ হয়েছিল তখন। একটু ব্যক্তিগতভাবে জড়িত ছিলাম বলেই কথাগুলি আলাদা করে বললাম।

প্রশ্ন : 'একটি পত্রিকার কথা' আপনি লিখেছিলেন 'নাউ' বন্ধ হবার অব্যবহিত পরেই। আজ প্রায় কুড়ি বছরের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে ভারতীয় সাংবাদিকতার ইতিহাসে 'নাউ' পত্রিকায় সত্যিকার মূল্যায়ন কী হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : 'নাউ' আলাদা একটি স্বাদ বিতরণ করেছিল, স্পষ্ট, ভিন্ন, স্বতন্ত্র একটি দৃষ্টান্তও স্থাপন করেছিল। অনুচ্চারিত কতগুলি অনুশাসনের প্রতি সম্পাদক হিসেবে সমরবাবু নিজেকে অঙ্গীকৃত করেছিলেন, তথাকথিত প্রতিষ্ঠান ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্মোহের বাইরে থাকবেন, সমাজের অধবর্ণদের কথা বলবেন, রেখে-ঢেকে বলবেন না, তাঁর একান্ত কাছের মানুষও যদি অন্যায় করেন সেই অন্যায়ও উদঘাটন করবেন এবং কোনো প্রথাগত নিয়মের ফাঁদে পা দেবেন না—অর্থাৎ তাঁর নিজেকে জানানো, নিজেকে মানানো—এই নিয়মগুলি তিনি মেনে চলবেন, কারণ তাঁর বিবেক তাঁকে কথাগুলি বলছে। সমরবাবু অক্ষরে-অক্ষরে সেই নিয়মগুলি মেনে চলেছিলেন, চলেছিলেন

বলেই গত পঁচিশ বছর ধ'রে তাঁকে এত কৃচ্ছ্রের ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছিল। এটা মস্ত বিষণ্ণতার কথা যে, যে-ঐতিহ্য স্থাপন করার চেষ্টা 'নাউ' করেছিল তা কিন্তু তেমন ছড়িয়ে পড়ল না। সেই কৃচ্ছ্রসাধনার ঐতিহ্য দেশ থেকে এখন, লক্ষণাদি দেখে মনে হয়, প্রায় ধুয়ে-মুছে গেছে। একজন-দুজন আছেন—এখানে ওখানে—, কিন্তু ঐ পর্যন্ত। মুম্বাইতে 'ইকনমিক এ্যাণ্ড পলিটিকাল উইকলি' সাহস দেখিয়ে চলেছে; এখানে কলকাতায়, ও আমার মতের সঙ্গে যতই অমিল হোক, ফ্রন্টিয়ার সম্বন্ধে বলব যে তাঁরা আদর্শের প্রতি তন্নিষ্ঠ থেকে গেছেন। কিন্তু তেমন বেশি উদাহরণ এই আশি কোটি মানুষের দেশ ঢুঁড়লে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইংরেজি বাদ দিয়ে আমাদের দেশে বিভিন্ন ভাষায় যে-সমস্ত পত্রিকাদি বেরোচ্ছে তাদের কথাও যদি উল্লেখ করি, তাহলে খুঁজে পাওয়া যাবে না। অধিকাংশ পত্রিকাই—এখানে-ওখানে-সেখানে, ব্যাঙ্গালোরে, দিল্লিতে, নাসিকে, গাজিয়াবাদে, রায়পুরে ইত্যাদি নানা জায়গায় যা প্রকাশিত হচ্ছে—, তা হয় কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের, নয় কোনো সংগঠিত রাজনৈতিক দলের আশ্রয়ে, তার বাইরে একা দাঁড়িয়ে লড়াই করবার সাহস কিংবা ইচ্ছা যেন প্রায় অন্তর্হিত।

প্র : 'নাউ'-এর কথা আপনি লিখেছেন। 'ফ্রন্টিয়ার'-এর অভিজ্ঞতা এখনও সবিস্তারে কোথাও সম্ভবত বলেন নি, 'নাউ' ও 'ফ্রন্টিয়ার'-এর সাংবাদিকতার মধ্যে সত্যি কি কিছু প্রভেদ আছে? 'নাউ'-এর তুলনায় 'ফ্রন্টিয়ার'-এ কিছু বেশি স্বস্তি কি বোধ করেছিলেন আপনারা? এবং পত্রিকায় লেখাতেও কি তার প্রকাশ ঘটেছিল? পত্রিকার সুস্পষ্ট কিছু নীতি কি নির্ধারিত হয়েছিল? 'ফ্রন্টিয়ার' কি প্রথম থেকেই 'নাউ'-এর চাইতে কিছু কম 'এলিটিস্ট' এবং আরো বেশি খোলাখুলি রাজনীতিক পত্রিকা হবার কথা ভেবে এগিয়েছিল?

উত্তর : 'ফ্রন্টিয়ার'-এ লিখেছি মাত্র প্রথম দু বছর ১৯৬৮ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৭০ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। তারপর 'ফ্রন্টিয়ার'-এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে গেছে এবং আমি নতুন করে লেখবার তাগিদ কোনোদিন অনুভব করিনি। একটা কারণ, সেই ১৯৭০-৭১ সাল, খুব গোলমেলে সময় গেছে সেটা, অনেকেই বুঝতে পারছেন না, দেশে কী হচ্ছে বা হ'তে যাচ্ছে। সমরবাবু যে-ধরনের তাগিদ সেই সময় থেকে অনুভব করতে শুরু করলেন, তার সঙ্গে আমরা অনেকেই—গোড়ার দিকে যারা 'নাউ'-তে লিখেছিলাম এবং ফ্রন্টিয়ার-এও লিখতে শুরু করেছিলাম—আমাদের মন মেলাতে পারলাম না। 'নাউ'তে অন্তত একটি বহুপাক্ষিক বামপন্থার ও বাম অভিমতের প্রকাশ ঘটত। আমাদের কারো কারো মনে হয়েছিল যে ফ্রন্টিয়ার বছরখানেক গড়িয়ে যাওয়ার পরেই একটু একপেশে হয়ে

যাচ্ছে। সেই কারণে আমাদের মধ্যে খানিকটা মানসিক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছিল। আমি সমরবাবুর ত্যাগ, তিতিক্ষা, কষ্টস্বীকারকে শ্রদ্ধা ও অভিবাদন জানিয়ে এসেছি বারবার, কিন্তু 'ফ্রন্টিয়ার' সম্পর্কে আলাদা করে কোনো মন্তব্যে লিপ্ত হতে চাই না। কারণ, সত্যিই, পত্রিকাটি সম্বন্ধে আমার পরিচয় তেমন গভীর নয়।

প্র : 'সম্পাদক' হিসেবে সমর সেনের ভূমিকা সঠিক ভাবে কী ছিল? লেখার পরিকল্পনা, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি প্রশ্নে তিনি কি কোনো নির্দিষ্ট, নিজস্ব অবস্থান থেকে কাজ করতেন? নাকি আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়েই স্থির করতেন সেটা? সত্তর দশকের সব চাইতে চাঞ্চল্যকর যে ঘটনা, অর্থাৎ নকশালবাড়ি আন্দোলন, তার বিষয়ে 'ফ্রন্টিয়ার'-এর ভূমিকা ও দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে এ-নিয়ে কি সমর সেনের সুস্পষ্ট কোন অভিমত বা নির্দেশ ছিল? মতান্তর ঘটলে তাকে সমর সেন কীভাবে গ্রহণ করতেন? আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কী?

উত্তর : সমরবাবু নিজেরই পঙ্‌ক্তি, যেটি মার্কসের সূত্রের প্রথম কথা, 'জীবনধারার ছাপ চেতনাকে গড়ে।' আমি বোধহয় 'এক্ষণ' পত্রিকায় প্রকাশিত ঐ প্রবন্ধেই লিখেছিলাম যে সমরবাবুর পারিপর্শ্বিকতার তেমন কোন প্রভাব কিন্তু তাঁর পত্রিকার ওপর পড়েনি। কিন্তু এ-কথাও সেই সঙ্গে আমার মনে হয়েছে যে এটা বহিরবয়বের ব্যাপার, ভদ্রলোকের স্থূলে ভুল ছিলনা। গুটিকয় বিশ্বাসের তিনি বশবর্তী ছিলেন, সেই শক্ত খুঁটিতে, সেই বিশ্বাসে, ভর দিয়ে তিনি বারবার দাঁড়িয়েছিলেন। 'নাউ' যে একটি রাজনৈতিক পত্রিকায় পর্যবসিত হল এবং হুমায়ুন কবির যে শেষ পর্যন্ত সমরবাবুকে অপসারণ করতে বাধ্য হলেন, সে-বিষয়ে বলবো আমার মতো কয়েকজন নিমিত্ত মাত্র ছিলাম। আমরা নিমিত্ত যদি নাও হতাম, আমার ধারণা, পশ্চিমবাংলায় এমন ধরনের ঘটনাক্রম তখন ঘটেছিল যে সমরবাবু একটা সময় নিজে থেকেই কতগুলি সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হতেন, নিজে থেকে, ভিতর থেকে তাগিদ বোধ করতেন, ফলে যেটা ছ'মাস আগে হয়েছিল সেটা হয়ত ছ'মাস পরে ঘটত। যদি প্রশ্ন করেন সম্পাদক হিসেবে তাঁর প্রধান গুণ কী ছিল, আমি বলব স্বল্পভাষণের গুণ। কম কথা বললে সে-কথার ওজন অত্যন্ত বেশি হয়। সম্পাদক সমর সেন অত্যন্ত কম কথা বলতেন। টেলিফোনে সামান্য মৃদু একটি দুটি কথা, খুব মৃদু উচ্চারণে; কাউকে হয়ত পোস্টকার্ডেই দু ছত্র লিখে পাঠানো; কিন্তু যাঁদের কাছে বাণী পাঠালেন তাঁরা ঠিক বুঝে নিলেন কী চাইছেন তিনি। একটি বিশেষ প্রতিভা প্রয়োজন সম্পাদকদের ক্ষেত্রে, যা আমরা দেখেছি শচীন চৌধুরী মশায়ের মধ্যে, এবং সমরবাবুর মধ্যেও দেখেছি : কাকে দিয়ে কোন্ লেখাটি লেখানো যাবে—এবং মেলানো যাবে পত্রিকার চরিত্রের সঙ্গে তা চট করে বুঝে নিতে পারতেন। পাশাপাশি—অন্য যে-

বিষয়ের উল্লেখ করতেই হয়, অসম্ভব গণতান্ত্রিক মানুষ ছিলেন। হয়তো কলেজের পড়ুয়া আদর্শবাদী ছাত্র লেখা নিয়ে এসেছে, ইংরেজি প্রতিটি বাক্য অশুদ্ধ, ব্যাকরণ অশুদ্ধ, কিন্তু কাউকে অবজ্ঞা করেন নি, প্রত্যেকের সঙ্গে সম্মান দিয়ে কথা বলেছেন। যদি বুঝতে পারতেন যে কোন লেখাকে ভদ্রস্থ করা যাবে, শুধরে টুধরে নিয়ে ছাপানো যাবে, আপ্রাণ চেষ্টা করতেন, ধরে রাখতেন লেখাটি, এক মাস দু-মাস, তিন মাস, চার মাস। পরিশোধন পরিমার্জনার কাজ ওঁর শরীরে দিচ্ছেনা—অন্য কাউকে, রচনাটি দিতেন, এমন কাউকে যাঁর উপর আস্থা স্থাপন করতে পারতেন, 'একটু দেখে দিন তো, দাঁড় করানো যায় কিনা।' এই ধরনের অনুকম্পা যে কোন সমাজ-সচেতন, বিবেক-আশ্রয়ী সম্পাদকের কাছ থেকে সমাজ আশা করতে পারে। এই ক্ষেত্রে আশাভঙ্গ ঘটেনি, সমরবাবু তাঁর সামাজিক দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে পালন করে গেছেন।

মতান্তরের প্রসঙ্গ। 'নাউ' চলাকালীন সম্পাদকীয় প্রবন্ধের সঙ্গে আমাদের কারো মতান্তরের বিশেষ সমস্যা দেখা দেয়নি। কারণ হয়ত যে তার শতকরা পঁচাত্তর থেকে আশি ভাগ মন্তব্য আমাদের, নিজেদেরই কারো না কারো লেখা—'ক' লিখেছেন বা 'খ' লিখেছেন ভাগাভাগি করে। তবে অনেক সময়, যেমন 'নাউ'-এর পর্যায়ে, আমি ওঁকে তাগিদ দিতাম, রাজনীতির কথা আরো একটু বেশি থাকলে ভাল হয়, ওঁর অন্য বন্ধুরা হয়ত বলতেন, একটু কম থাকা ভাল। 'ফ্রন্টিয়ার' পর্বে আমার সঙ্গে যে মতপার্থক্য হতে শুরু হলো তা রাজনীতিঘটিত—উনি যে-ঝোঁকটাকে মেনে নিতে পেরেছিলেন, বিশ্বাস আরোপ করেছিলেন। আমি সেই আস্থা রাখতে পারিনি। তবে তা নিয়ে মাত্র একদিনই অন্য এক বন্ধুর বাড়িতে জোর তর্ক হয়েছিল মনে পড়ছে, কিন্তু তাতে আমাদের ব্যক্তিগত সৌহার্দ্যে কোনদিন ভাটা পড়েনি। যাইহোক, সত্তর দশকের গোড়ায়, পশ্চিমবাংলায় যে ঘটনাবলী ঘটছিল তা নিয়ে অনেক রকম মত এবং মতান্তর ছিল এবং আছে—পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে আর বিশেষ লাভ নেই এখন। সমরবাবু হয়ত একটি বিশেষ মতের দিকে সেই মুহূর্তে ঝুঁকে পড়েছিলেন, তার পরের ইতিহাস নিজের নিয়মে বয়ে গেছে। ওরকম ভাবে ঐ সময়ে ঐ দিকে উনি ঝুঁকলে কী হতো বা না হতো তা নিয়ে এখন, মনে হয় কথা বাড়ানো পণ্ডশ্রম।

প্র : পত্রিকার বাইরে মানুষ সমর সেনকে আপনি যে-ভাবে জানতেন তারও কিছু পরিচয় জানতে চাই। নিজের কবিতা অথবা কবিজীবন সম্পর্কে কি কোন দুর্বলতা সমরবাবুর অবশিষ্ট ছিল?

উত্তর : সব চেয়ে বড় কথা, যা আমি বহুবার বহু জায়গায় বলেছি, তা মানুষটির অবৈকল্য। মন আর মুখে কোন তফাৎ ছিল না। তার অর্থ এই নয় যে উনি খুব রূঢ়ভাষী

ছিলেন। রূঢ়, রুক্ষ হতে পারতেন, কিন্তু সব সময় হতে দিতেন না নিজেকে। আমার যেমন বাজারে একটি অখ্যাতি আছে, অকথা-কুকথা বলি। সমরবাবু সম্বন্ধে সে-রকম কেউ কিন্তু কোনোদিন বলতে পারবেন না। তিনি আগ বাড়িয়ে গিয়ে কাউকে কুকথা বলেছেন। স্পষ্ট কথা বলেছেন, কিন্তু যেটাকে অসৌজন্য ব'লে অভিহিত করা যায় বাঙালিদের সামাজিক ব্যাকরণে—সে ধরনের অসৌজন্য কারো প্রতি কোন দিন দেখান নি—যাঁর প্রতি তিনি গভীর ভাবে বিরক্ত তাঁর প্রতিও দেখান নি। অথচ নিজের বিবেক থেকে, নিজের নীতি থেকে, নিজের ধর্ম,থেকে সামান্যতম সরেও আসেননি কখনো। তাঁর সততার কোন তুলনা নেই।

ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় কবি বন্ধুদের কথা সমরবাবু বলতেন, কিন্তু নিজের কবিতা নিয়ে কোন দিন কথা বলতে চাইতেন না। কবিদের কথা বলতেন—সুধীনবাবুর কথা, বিষ্ণুবাবুর কথা, বুদ্ধদেববাবুর কথা। জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে তেমন একটা পরিচয় ছিল না বলতেন। নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু—কামাক্ষীপ্রসাদ-দেবীপ্রসাদ এঁদের কথা অবশ্যই বলতেন কখনো কখনো সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গও। ঘরোয়া আড্ডায় বার-বার অন্য বন্ধুদের নামও উচ্চারণ করেছেন যেমন সুনীল জানা, শোভা দত্ত, অথবা কৃষ্ণনগরের দেবী ভট্টাচার্য। তাঁর এক বন্ধু—কয়েক সপ্তাহ হলো তিনি প্রয়াত হয়েছেন—কৃষ্ণদাস গুপ্ত, তাঁর কথাও বলতেন। এই ভদ্রলোকও এক সময় কবিতা লিখতেন, গদ্য কবিতা, আপনারা কেউ তাঁর কবিতা পড়েন নি, সমরবাবুর অকৈশোর বন্ধু, এক সঙ্গে হুল্লোড় করতেন। সে-সব হুল্লোড় নিয়ে প্রচুর গল্প করতেন, খুব খোলা মনে, মজা করে বলতেন, সবটাই ছিল নির্বিষ মজা। ক্বচিৎ কখনো অতি মার্জিত আদি রসের চর্চা। কিন্তু কাব্যের গুণ, কাব্যের ব্যাকরণ, কাব্যের সমাজ-ধর্মিতা কিংবা সমাজ-বিদ্রোহিতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কোন মন্তব্য কোনদিন করেন নি। কবিতা প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে বরং অধৈর্য হয়ে উঠতেন, একটি কথা প্রায়ই ব্যবহার করতেন,—'ন্যাকামি', ন্যাকামি হচ্ছে'।

নিজের কবিতা নিয়ে সামান্য কিছু দুর্বলতা হয়ত, তাহলেও, তাঁরও ছিল। মনে আছে একবার, সম্ভবত ১৯৬৫-৬৬ সালে, যখন ওঁকে বললাম পুরোনো দিনের একটি ইতিবৃত্ত জানতে চাই, খুশি মনে দুটো পুরোনো খাতা পড়তে ধার দিলেন। ছাত্রবয়সে ব্যবহৃত বাঁধানো খাতা, যখন খুব বেশি কবিতা লিখতেন এবং খুব বেশি পড়াশুনা করতেন সেই সময়কার। অনেক কিছু ছিল সেই খাতা দুটিতে। কবিতার খসড়া, কবিতার ইংরেজি অনুবাদ কী কী বই পড়ছেন তখন তাদের তালিকা, সে-সমস্ত বই থেকে কিছু-কিছু উদ্ধৃতি একজন দু'জন সহপঠিনীর নাম, তাঁদের নিয়ে মস্করা। পরে তাঁর বড় মেয়েকে ঐ খাতা দুটো দিয়েছিলেন।

প্র : কবি ও সাংবাদিক সমর সেন সম্পর্কে শেষ বিচারে আপনি কী বলবেন? ভবিষ্যৎ ইতিহাস তাঁকে কীভাবে দেখবে বলে আপনার ধারণা?

উত্তর : এখনও বলবো, এবং আমার দশ পনেরো বছরের যাঁরা বয়ঃকনিষ্ঠ তাঁদের বিদ্রূপাত্মক প্রতিবাদের আশঙ্কা সত্বেও বারবার বলবো : যখন তাৎক্ষণিকতার ঝড়-ঝঞ্ঝাগুলি থিতিয়ে যাবে, তখনও কিন্তু সমর সেনের কাব্য একটি বিশেষ সময়ের প্রতিবিম্ব হয়ে বেঁচে থাকবে। আমি যেমন তাঁর ১৯৩৭ সালে লেখা কবিতা এই ১৯৮৭ সালে সমান অনাড়ষ্টতার সঙ্গে পড়তে পারছি, গ্রহণ করতে পারছি, উপভোগ করছি, আমার ধারণা ২৩৩৭ সালেও ঠিক সেই পরিমাণ উপভোগ্যতা-গ্রহণীয়তা সমরবাবুর কবিতায় ছুঁয়ে যাবে।

অন্যদিকে, একটি বিশেষ বিবেকদংশন, যাঁরা এখন প্রচুর পয়সাকড়ি করছেন সাংবাদিকতা থেকে, তাঁদেরও মধ্যে উদ্রিক্ত হচ্ছে যে আমরা করে খাচ্ছি, আর ঐ লোকটা কিন্তু একটা স্রেফ আদর্শের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করল। এ ধরনের পাপবোধ এখনই মাঝে মধ্যে এঁর ওঁর তাঁর মধ্যে হতে দেখি। বর্তমানে যে-রাজনৈতিক, সামাজিক বিচারগত অস্থিরতা তথা মানহীনতা ভারতবর্ষের প্রধান লক্ষণ, সেটা সাময়িক, আমার ধারণা এই বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের মধ্য থেকেই নতুন কিছু নিয়মকলা ভূমিকার পুনর্মূল্যায়ন হবে।

তবে আমাকে যোগ করতেই হয়, ভূত-ভবিষ্যৎ তত্ত্বে সমরবাবুর আদৌ শ্রদ্ধা ছিল না, তাঁর অবর্তমানে তাঁর স্বীকৃতির পারা উপরে চড়লো কি নামলো সেই চিন্তায় অন্যের ভাত হজম হওয়া বিঘ্নিত হতে পারে, তাঁর কদাচ হত না। শেষ পর্যন্ত বন্ধুদের প্রীতি ও আনুগত্যের বাইরে সত্যিই পৃথিবীর কাছ থেকে তিনি অন্য কিছু আশা করেননি।